তোমার বসন্ত বাড়ি

ফারহানা তেহসীন

সময় নাই, সময় নাই।

ফুরিয়ে যাচ্ছে- এত দ্রুত ঘড়ির কাঁটা ঘুরে, এমন তো মনে হয়নি আগে। কেয়া দেয়াল ঘড়িটা দেখে নিচ্ছে একটু পরপর। হাত চালালো আরও দ্রুত। আরিফ আজ তিতা করলা খেতে চেয়েছিল। কেয়া মাঝেমাঝে বুটের ডাল দিয়ে করলা মিশিয়ে সুস্বাদু একটা তরকারি রাঁধে, আরিফের খুবই পছন্দের। চটজলদি মাছ, করলা আর পটলের সবজি রাঁধল। বাবুন ফেরে চারটায়। যাবার আগে বলছিল পই পই করে- মা আজ পিৎজা বানিয়ে রেখ, প্লিজ--- প্লিজ---। এমন করে বলে গেল ছেলেটা, না বানিয়ে উপায় আছে? কেয়া আবার ঘড়ি দেখে নিল। মিনিটের কাঁটা চলছে। টিক্ টিক্, টিক্ টিক্।

সময় নাই। সময় নাই।

রুদায়না কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পায়নি। বলল, "মা ইউ লিভ দ্য কিচেন রাইট নাও, টেক শাওয়ার, তোমার না এয়ারপোর্ট যাবার কথা আছে।"

কেয়া স্নেহ ভরে মেয়ের দিকে তাকাল। মেয়েটা কেন এত লক্ষী? বিদেশে বড় হয়েছে কিন্তু মনে প্রাণে ষোলআনা বাঙালি।

আবার বলল, "বাবুনের পিৎজা আমি বানিয়ে রাখব। ডোন্ট ওরি।"

মেয়েটা কেন যে বড্ড বেশি ভাল!

আশ্বস্ত হয়ে কেয়া তৈরি হতে চলল। ওয়ারড্রব থেকে শাড়ি বের করল। কত যে শাড়ি! কোন্‌টা পরবে, ভাবতে লাগলো। বেগুনী নাকি নীলটা ?

আরজু ভাই এর প্রিয় রঙ ছিল। একদিন বলছিল, "এই তোর বোগেনভেলিয়া রঙের শাড়ী আছে ?"

"কেন বলেন তো ?"

"তোকে পরীর মত লাগবে, পরে দেখিস।"

আরজু ভাইয়ের সাথে কথা বলতে গেলে বুকটা কাঁপত। কেন যে কাঁপত।

'আমার তো কোন শাড়ীই নাই। মায়ের থেকে চেয়ে নিয়ে শাড়ী পড়ি।'

'অসুবিধা নাই, আমি কিনে দেব।'

আরজু ভাই শাড়ী কিনে দেয়ার প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলেও কেয়া মনে রেখেছিল। প্রথম যেদিন বোগেনভেলিয়া রঙের শাড়ি পরেছিল অনেকক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন সে একটা নীলরঙা শাড়ি বেছে নেয়। রান্না ঘর থেকে রুদায়নার কণ্ঠ ভেসে আসে মা, "আর ইউ রেডি ?"

চটজলদি অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে বের হবার আগ মুহূর্তে হাতের মুঠোফোন বেজে উঠল। আরিফের কল।

'এখন ও বের হওনি ?'

'হচ্ছি তো। তুমি এসে লাঞ্চটা সেরে নিও। বাবুনের আজ বাস্কেটবল প্র্যাকটিস আছে, ওর ফিরতে দেরি হবে।'

'তুমি ভেব না, তোমার দেশি ভাই আসছে। রিলাক্স, গো অ্যান্ড মিট হিম। ভাল কথা! এটা কোন পাড়াতুতো, প্রেমতুতো ভাই নয় তো ? হা হা হা.....। জাস্ট জোকিং। সরি, তুমি তো আবার জোক নিতে পার না।'

কেয়ার বুকটা দুরুদুরু কেঁপে উঠল আচমকাই। বরাবরি সে এমন। অল্পে অস্থির, ভীত, কিংকর্তব্যবিমুঢ় আর অশান্ত। কেন যে এমন!

হাত ঘড়িটা দেখে নিল। লিফটে উঠার পর থেকে মনে হচ্ছিল অনন্ত কাল ধরে সে যেন লিফটে আটকে আছে। তালের রস দিয়ে পাতায় মুড়ে
অসাধারণ পিঠা বানাত মা, খেতে এত স্বাদ! সুজা ভাইয়ের সাথে আরজু ভাই প্রায় আসত ওদের বাসায়। প্লেটে করে পিঠা খেতে দিয়েছিল মা। তৃপ্তির স্বাদ নিয়ে একটার পর একটা খেয়ে যাচ্ছিল আরজু ভাই। আচমকা তাকে বলে বসল-

'এই তুই এই পিঠা বানাতে পারিস ?'

'না, মা বানিয়েছে'।

'তুই দেখছি অকর্মার ঢেঁকি। শিখে রাখিস, আমার খুব পছন্দের। রোজ বানিয়ে খাওয়াবি।'

'রোজ কেন বানাব, আপনি কি রোজ আসবেন ?'

'বুঝলি না কিছুই। বুঝে না কিচ্ছু আক্কাবাক্কা, সূর্যেরে কয় গাড়ির চাক্কা।'

আরজু ভাইয়ের পছন্দ, তাতে কি। বয়েই গেল! কেন যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত আরজু ভাইকে দেখলে। কেন যে! কেন যে!

প্রথম যেদিন এসেছিল তাদের আশখাঁর দীঘির বাসায়, দরজা খুলে দিয়েছিল এলোচুলে পড়ন্ত বিকেলে। দরজায় দাঁড়িয়ে একই রকম পরোয়াহীন ভাবে মানুষটা বলেছিল-

'ওমা এই মেয়েটা আবার কে? সুজাতো কোনদিন বলেনি ওর এমন সুন্দর বোন আছে। সুজাটা গেল কই? ডাকো তো দেখি রাজকন্যা।'

সেদিন আশখাঁর দীঘির ঢেউগুলো কেয়ার মনের ভিতর হিল্লোল তুলে গিয়েছিল। এ কেমন মানুষ!

সিঙ্গাপুরের সেংকাং এ নবনির্মিত দালানগুলো ভারী মনোরম। সব কটি ব্লকের দালানগুলো একই রকম দেখতে। বি ব্লকের একটা ফ্ল্যাট চার বছর আগে কেয়া আর আরিফ পছন্দ করে কিনেছিল। এখন কিস্তিতে পরিশোধ করে চলেছে বাড়ির মূল্য। সেংকাং থেকে সিঙ্গাপুর চাঙ্গি এয়ারপোর্ট ঘণ্টাখানেকের রাস্তা।বের হবার আগে ট্যাক্সি কল করে রেখেছিল আরিফ। নিচে নেমেই চোখে পড়ল ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এর কাছে দাঁড়ানো কালো গাড়িটা। এখানে প্রতিটি ব্লকের নিচে ছোট ফুড কোর্ট থাকে আর সাথে থাকে আনুষঙ্গিক সামগ্রীর দোকান। ট্যাক্সিতে উঠার আগে ফুড কোর্ট এর সামনে দিয়ে ফুলের দোকানটাতে চলে এল কেয়া। কাঁচা ফুল, শুষ্ক ফুল দুটোই আছে। চটজলদি ফুল হাতে বের হয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে সে।

সিঙ্গাপুরে রাস্তাতে কোন হর্ন শোনা যায়না। এমন অভ্যাস হয়ে গেছে গত ক বছরে, এখন ছুটিছাটায় দেশে গেলে রাস্তায় যানজট আর ভেঁপু বাজানোর শব্দে চমকে উঠতে হয়। কেয়ার বেশ মনে পড়ে রুদায়নার যখন পাঁচ বছর বয়স তখন বেশ লম্বা সময়ের জন্য দেশে গিয়েছিল একবার। রাস্তায় বের হলে জোরে কান্না জুড়ে দিত ভয়ে। আইল্যান্ড এর ফুলগুলো এখানে সবসময় ফুটে থাকে। কেয়ার চোখ জুড়িয়ে যায়।

আজ একটু পরপর ঘড়ির দিকে চোখ। কিছুক্ষনের ভেতর প্লেন ল্যান্ড করার কথা। রাস্তা জ্যামশুন্য। সময়ের ভেতর পৌছানো যাবে আশা করা যায়। আচ্ছা প্রথম দেখাতে কি বলবে সে ? কতদিন পর দেখা। এখন তো ভাল করে মনেও পড়ছে না আরজু ভাইকে সে তুমি নাকি আপনি বলত। এত বয়স হয়েছে, কতবার সূর্য ডুবেছে উঠেছে এর মধ্যে পৃথিবীর বুকে হিসাব নেই। আরজু ভাইকে দেখে তার বুকটা নিশ্চয়ই আগের মত কেঁপে কেঁপে উঠবে না। হাসি পেয়ে গেল কেয়ার। কেন এত কথা ভাবছে সে।

আরজু ভাই বড় ভাইয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। লেখাপড়ায় দুর্দান্ত, সাহসি, নির্ভীক আর সুদর্শন। যেদিন কেয়ার বিএ পরীক্ষার রেজাল্ট দিল আরজু ভাই হাজির।

'সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছিস, তুই যে একটা কি। আল্লাহ তোকে শুধু রূপ দিয়েছেন ঘিলু দেয়নাই। ফার্স্ট ক্লাস বাগাতে পারলি না।'

এমন লজ্জা লাগছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল আশখাঁর দীঘির টলমল পানিতে ডুব মারে।

'আরও ভাল করে পড়। এমএ তে ফার্স্ট ক্লাস চাই বুঝলি। বিদেশে চলতে হলে ইংরেজির কোন বিকল্প নাই জানিস তো।'

'বিদেশের কথা আসছে কেন, মাস্টার্স করতে আমাকে বিদেশে যেতে হবে ?'

'যেতে হবে না মানে, আমার সাথে যাবি না ?'
'মানে ?'

'বুঝে না কিছু আক্কাবাক্কা সূর্যেরে কয় গাড়ির চাক্কা।'

মুঠোফোনে রিংটোন বাজতেই মনে হল গাড়ি নয়, সে যেন টাইম মেশিনে উঠে বসেছিল। যেটা তাকে নিয়ে পিছনে ছুটল। সেই বাইশ বছর আগে। কি আশ্চর্য! কি দুর্বার তার গতি। এক লহমায় পার হয়ে যায়।

কোটি কোটি ক্ষণ।

কোটি কোটি পল, অনুপল।

কেন যে। কেন যে।

রুদায়না কল করেছে। জানতে চাইছে কেয়া পৌঁছে গেছে কিনা। একেবারে মায়ের ভূমিকা। প্রশান্তি আর গর্বের বদলে কেয়ার ভারী দুশ্চিন্তা হয়। এত ভাল কেন হল মেয়েটা কে জানে।

এই বয়সী মেয়েরা যেখানে বন্ধু, ফেসবুক, মুভি, পার্টি কত কিছু নিয়ে মেতে রয়েছে, সেখানে এই ষোলআনা বাঙালি মেয়েটাকে নিয়ে তার বড় ভয়।

নিজেকে নিয়েই কি কম ভয় ছিল তার ? একদিন হন্তদন্ত হয়ে আরজু ভাই এলেন, বললেন;

'যাও তো রাজকন্যা তোমার মাকে ডাক দেখি, দারুন সুখবর আছে।'

প্রথমটায় তার নিজেরই এত উত্তেজনা হচ্ছিল। আশখাঁর দীঘির সব ঢেউগুলো বুকের ভেতর তাল মাতাল। এমন উত্তাল সেই শব্দ, নিজেরই কান পাতা দায়। তার খানিক পরেই এমন শান্ত হয়ে গিয়েছিল, ওর মনে হচ্ছিল গোটা দীঘির জল এক লহমায় শুকিয়ে মরুভূমি।

জল নেই। জল নেই।

এক ফোঁটাও না।

'খালা আমি স্কলারশিপ পেয়েছি। আমেরিকার নামকরা ইউনিভার্সিটিতে। এই মাসের শেষেই চলে যাব।'

"চলে যাব- চলে যাব"------ শব্দ দুটো কত হাজারবার কানে বেজেছিল, আজ আর মনে নেই। শুধু মনে হত কেবল রাস্তার ওপারেতে নয়, তার বুকের ভেতরেও একটা টলমলে দীঘি ছিল-- পানিতে টইটম্বুর। সেটা নিমিষে মরুভূমি।

শেষদিন পর্যন্ত আরজু ভাই আসবেন--- যে কথাটা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি সেটা বলবেন--- এরকম একটা বিশ্বাস ছিল অথচ কি বিস্ময়, কিছুই না বলে চলে যেতে পারলেন ?

প্রচন্ড অভিমানে জল আসতো চোখে।

নিজের বুকের ধ্বংসযজ্ঞে নিজেরই কান পাতা দায়।

তারপর আর কি---- । আলুথালু মন নিয়ে আকণ্ঠ ডুবে থাকা বেদনার দীঘিতে।

বাইশ বছর পরে গেল সপ্তাহে যেদিন ফোনটা বেজে উঠেছিল, কণ্ঠ চিনতে কষ্ট।

"চিনতে পারছিস না ? আমি আরজু, তোর দাদার বন্ধু। সুজার সাথে ফেসবুকে যোগাযোগ ছিল গত তিন বছর ধরে। তার কাছেই তোর খবর নিলাম। এবার দেশে যাচ্ছি, সিঙ্গাপুর হয়ে। ভিসা নিয়েছি। তোদের ওখানে সাত ঘণ্টার ট্রানজিট আছে। তোর কথা এত মনে পড়ছিল, কি বলব। তুই কি আসবি এয়ারপোর্টে ? অনেকদিন দেখা নেই। না করিস না, তোকে অনেক কিছু বলার আছে।"

আকাশ থেকে পড়া কি একেই বলে ? এত বছর পর কিভাবে এত জোর গলায় কথা বলে? কোন শক্তিতে, কোন অধিকারে ? মানুষটা কি ? এই ক'বছরে একটুও বদলায়নি ?
পরের বছরে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কেয়ার। তার সংসারে এত মায়া মাখামাখি হয়ে থাকবে- নিজেও কোনদিন ভাবেনি। মনের ভেতরের দীঘিটাতে জল জমতে শুরু করেছিল একটু একটু করে। আরিফের সাহচর্যে। বিয়ের প্রথম দিন বলেছিল-

'আমি খুব সাদাসিধে মানুষ। তোমাকে একটা সুন্দর সংসার দেব। ইট কাঠের নয়, খুব শান্তির ঘর হবে আমাদের। বছরের বারমাস তাতে বসন্ত থাকবে। আমার ঘরে তোমার হাসি হবে সেই বসন্তের ফুল, যখন হাঁটবে তোমার শাড়ির আঁচলে দুলবে বসন্তের হাওয়া। আমাদের ছানাপোনাগুলোর হাসি-কান্না হবে কোকিলের কলতান। আমরা যখন যেখানে থাকব বাড়িটার নাম হবে বসন্ত-বাড়ি। আরে দেখ, আমিতো তোমাকে দেখেই কবি হয়ে গেলাম---হা---হা---------- ।'

মনের ভেতর প্রশান্ত দীঘি। ইচ্ছে হলেই চোখ মুদে ডুব মারতে পারে সেই জলে। এখন কোথা থেকে ভেসে আসে মৌসুমি বায়ু, দীঘির জলের উপর দিয়ে?

কেয়া কি এইদিনটার অপেক্ষায় ছিল ? আরজুর সাথে কি কথা থাকতে পারে এত বছর পর ? আরজু কি এত বছর পর চল্লিশোর্ধ্ব এক নারীর কাছে পেশ করবে অব্যক্ত যৌবনের পান্ডুলিপি ? মানুষটার মনে কি এতদিনে অনুতাপ হয়েছে?

ক্ষমা চাইবে আরজু ?

নতজানু হয়ে ?

কি যে মাদকতা ছিল সেই রাতের বাতাসে--- কেন যে দেখা করার জন্য সম্মতি দিয়ে দিল! কেন যে ! কেন যে!

চাঙ্গি এয়ারপোর্ট কাছাকাছি। টাইম মেশিন থেকে নেমে পড়ার সময় হয়ে এল। এমন সময় আবারো রিংটোন বেজে উঠল।

'হ্যালো মা পৌঁছেছ ?'

'এই তো কাছেই। বাবুন ফিরেছে ?'

'ফিরেছে। বাবাও ফিরেছে।'

'খেয়েছে ?'

'হু। খেয়ে উঠেই কফি বানাতে গেল নিজ হাতে। গরম ফুটন্ত পানি হাতে পড়ে গেল বাবার অসাবধানে।'

'মানে!!!!!!!!'

'গরম পানি হাতে পড়েছে বললাম না ? বাবাকে বলছিলাম আমি কফি করে দেই, শুনল না।'

'হাত পুড়িয়ে ফেলল ?'

'আমি অবশ্য লাস্ট ১৫ মিনিট ধরে হাত আইসকোল্ড পানিতে ডুবিয়ে রেখেছি।'

'হাত বরফে ডুবিয়ে রাখ, আমি এখুনি ফিরছি।'

'ফিরছি মানে ? তোমার গেস্টের সাথে মিটিং হয়ে গেল?'

'না, আমি ফিরছি।'

'কুল- মা- আই ক্যান টেক কেয়ার অফ হিম। ইউ মিট হিম, কত দূর থেকে আসছে--- তোমার জন্য অপেক্ষা করবে না?

'পাকামো করিস না,আমি ছাড়ছি।'

ফোনটা মেয়ের হাত থেকে বাবার কাছে হস্তান্তরিত হল। আরিফের কণ্ঠ-
'কি হল বলত, ফার্স্ট ডিগ্রি বার্ন। ট্রিটমেন্ট চলছে। ডোন্ট ওরি। তুমি দেখা করে ফিরো, ভদ্রলোক অপেক্ষা করে থাকবে না ? তোমাকে না দেখে আশাহত হবে না ?'

'ছাই। আমি আসছি।'

ছোট একটা ঘর। ওখানে বাবুন আছে, রুদায়না আছে উদ্বিগ্ন হয়ে, কফি খাওয়ার অতৃপ্তি নিয়ে কষ্ট নিয়ে বসে আছে একটা মানুষ।

'ক্যান ইউ প্লিজ টার্ন এরাউন্ড ? আই উইল গো ব্যাক।'

কথাগুলো ছিল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে।

সময় নাই। সময় নাই। তাকে দ্রুত বাসায় ফিরতে হবে।

কেয়া ফিরছে।

বসন্ত বাড়ির দিকে।

[ফারহানা তেহসীনঃ *সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ স্বচ্ছন্দ হলেও গল্প রচনায় অধিক মনোযোগী ও নিবেদিত। ইতোমধ্যে বেরিয়েছে দু'টো কাব্যগ্রন্থঃ "মধ্য নিশীথের নীল" ও "দূরের গাঙচিল" আর ভ্রমণকাহিনী "কাঞ্চনজঙ্ঘার দেশে"। নিরবিচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন বিভিন্ন পত্রিকায়। সাহিত্য সম্পাদিকা, চট্টগ্রাম লেখিকা সঙ্ঘ। ব্যাক্তিগত জীবনে আতিকুল আজম খানের (২৭) সহধর্মিণী।]*